GivI gšx wKš KvR...!

wj‡L‡Qb Rqš AvPvh

২০ এপ্রিল, ২০০৫, বিকেল তিনটা। সচিবালয়ের গেট দিয়ে একের পর এক বের হচ্ছে পতাকাবাহী গাড়ি। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উপদেষ্টাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ ভ্যান। প্রায় প্রতিটি গাড়ি ছুটছে মৎস্য ভবন হয়ে মিন্টু রোডের দিকে। মন্ত্রীদের যাওয়ার সুযোগ করে দিতে ট্রাফিক পুলিশ হিমশিম খাচ্ছে। ভিআইপি সড়ক ফ্রি রাখতে হচ্ছে, ক্রস রোড প্রায় বন্ধ। পতাকা উড়ানো গাড়ির বহর লেগে যায়। যানজট শুধু বাড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে শহরের অন্যান্য জায়গায়। সেদিকে নজর দেয়ার সুযোগ নেই কারো। থাকবেই বা কিভাবে? বিশালায়তন মন্ত্রিসভার সবাই কম-বেশি ব্যস্ত নিজেদের নিয়ে।

বর্তমান মন্ত্রিসভায় ৫৩ জন মন্ত্রী ও মন্ত্রী পদমর্যাদার লোক রয়েছেন। এর মধ্যে ২৩ জন পূর্ণমন্ত্রী। ২৩ জন প্রতিমন্ত্রী, ৪ জন উপমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে ৩ জন পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করছেন। মন্ত্রিসভার বাইরেও মন্ত্রিত্বের সুযোগ ভোগ করছেন আরো ২০ জন। এই বিশালায়তন মন্ত্রিসভার অন্তত এক ডজন মন্ত্রীর তেমন কোনো কাজ নেই। তাঁরা মন্ত্রণালয় আসেন। সময় কাটান বিভিন্ন তদবির করে। অনেকে আবার কাজ দেখাতে গিয়ে ফাইল চালাচালিতে ব্যয় করেন অতিরিক্ত সময়। এতে শ্লথ হয়ে পড়ে নিয়মিত কার্যক্রম। তৈরি হয় সমন্বয়হীনতা। অথচ এসব মন্ত্রীর জন্য রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে প্রতি মাসে ন্যূনতম ১২ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। এমনিতেই অপ্রয়োজনীয় একাধিক মন্ত্রণালয় রয়েছে। সেগুলো পরস্পর সমন্বয় তো করা হয়ইনি বরং নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী দিয়ে মোট রাষ্ট্রযন্ত্রকে মাথাভারী করা হচ্ছে। মাঝখান থেকে শক্তিশালী হচ্ছে আমলাতন্ত্র। রাজনৈতিক সরকারের জবাবদিহিতায় একটা বিষয় আছে। আমলাদের তো তা নেই।

দেশের ৮০ ভাগ মানুষ শুধু দুইবেলা খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করছে। সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণহীনতায় বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। সংস্কারের নামে বন্ধ হচ্ছে কলকারখানা। এমন এক পরিস্থিতিতে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত মন্ত্রিসভায় ৫৩ জন মন্ত্রী পোষা কতোটুকু যৌক্তিক? অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান জাতিকে প্রায়ই উপদেশ দেন কৃচ্ছ্রতা সাধনের। এজন্য তিনি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শে অলাভজনক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধের নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষিখাতে ভর্তুকি বন্ধ করছেন। অথচ একবারের জন্য এ বিশাল মন্ত্রিসভার ব্যয়ভার কমানোর কথা বলেননি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মাত্র ১০

আব্দুল মতিন চৌধুরীকে বস্ত্র মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে করা হয় দপ্তরবিহীন। এক বছর ধরে তিনি এ অবস্থাতেই রয়েছেন। সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয় না থাকলেও পূর্ণমন্ত্রীর সমস্ত সুযোগই তিনি পান। থাকেন ২৪ নম্বর বেইলি রোডের বাসায়। রয়েছে তার গাড়ি, পিএস, এপিএস, নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী। শুধু নেই তথ্য কর্মকর্তা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অসুস্থতার কারণে মন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী বাসায় থাকেন। তবে কেবিনেট বৈঠক হলে মন্ত্রণালয়ে যান। এলাকার লোকজনও এখন বাড়িতেই আসেন। মতিন চৌধুরী মাঝে মাঝে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তদবির করে দেন

ব্যক্তি পুরো ৩৯টি মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন। তখন তো মন্ত্রণালয় পরিচালনায় কাজের কোনো সমস্যা হয় না। বরং মন্ত্রণালয়-গুলো আরো দক্ষভাবে চলে। তাহলে এখন কেন ৫৩ জন মন্ত্রীর প্রয়োজন? তারপরও কেন সরকারের কাজকর্মে স্থবিরতা?

মন্ত্রিসভার পেছনে বছরে ব্যয় ৮০ কোটি টাকা

চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৬০ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে যা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়। এ মন্ত্রিসভায় ২৭ জন দপ্তরপ্রাপ্ত পূর্ণমন্ত্রী, ২৮ জন প্রতিমন্ত্রী, চারজন উপমন্ত্রী, একজন দপ্তরবিহীন পূর্ণ প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। বিশাল ওই মন্ত্রিসভা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলে ২০০৩ সালের ২৩ মে প্রধানমন্ত্রী ৭ জনকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা ৫৩-তে নামিয়ে আনেন। এ সময় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েন এল কে সিদ্দিকী, হারুনুর রশিদ খান মুন্নু, এবাদুর রহমান চৌধুরী, আহসানুল হক মোল্লা, বরকতউল্লা বুলু ও রেদোয়ান আহমেদ। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বরকতউল্লা বুলুকে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা করা হয়। পুনঃবন্টন করা হয় বেশ কয়েকটি দপ্তর। গত বছর আবার প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভায় রদবদল করলেও আকার ছোট করেননি। বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে সরিয়ে দেয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে এনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।

দেশে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর বেতন, ভাতা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রথম '৭৩ সালে আইন পাস হয়। পরবর্তী সময়ে এ আইনের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে দফায় দফায়। জোট সরকার ক্ষমতায় এসে মন্ত্রীদের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়িয়েছে। বর্তমান আইন অনুসারে একজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। একজন পূর্ণমন্ত্রী ১৮ হাজার টাকা বেতন পান। টাকার এই অঙ্কটা তেমন বড় না হলেও আনুষঙ্গিক সুবিধাগুলো বেশ আকর্ষণীয়। মন্ত্রী পান দামি গাড়ি, যার জ্বালানি ও মেরামত খরচ সরকারি কোষাগার থেকে মেটানো হয়। উপ-সচিব পদমর্যাদা একজন আমলাকে তিনি পান ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে। এই সচিবও একটি গাড়ি পান। গাড়ির জন্য দৈনিক সাড়ে ছয় লিটার তেলের খরচ পান। এছাড়া কোয়ার্টার, টেলিফোন, সচিবালয়ে অফিস তো রয়েছেই। সচিবের পাশাপাশি মন্ত্রী মহোদয় নিজের আপনজনের মধ্য থেকে একজন এপিএস নিয়োগ দিতে পারেন। তার জন্যও রয়েছে বাড়ি-গাড়ির সুযোগ।

সরকারের সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় মন্ত্রীদের বাড়ির খরচে। একজন পূর্ণমন্ত্রী বাসভবন সজ্জিত করতে বছরে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। বাসভবনের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন বিল সরকারি কোষাগার থেকে মেটানো হয়। সরকারি বাড়ি না পেলে পছন্দমতো বাড়ি ভাড়া করতে পারেন। ভাড়া বাবদ তিনি মাসে ১৭ হাজার ৫০০ টাকা পাবেন। ভাড়া বাড়ির নিরাপত্তা ব্যয় সরকার বহন করবে। জনস্বার্থে হেলিকপ্টারের রিকুইজিশন দিতে পারেন। বিমানে রয়েছে বিশেষ সুযোগ। বিমানে তার বীমা সুবিধা থাকবে। তিনি বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিমান ভাড়া বাবদ খরচ করতে পারবেন। প্রয়োজনে এ খরচ আরো বেশি হতে পারে। মন্ত্রী চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারেন। বাসায় সাতজন ব্যক্তিগত স্টাফ রাখতে পারবেন। এছাড়া

দেশের ৮০ ভাগ মানুষ শুধু দুইবেলা খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করছে। সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণহীনতায় বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। সংস্কারের নামে বন্ধ হচ্ছে কলকারখানা। এমন এক পরিস্থিতিতে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত মন্ত্রিসভায় ৫৩ জন মন্ত্রী পোষা কতোটুকু যৌক্তিক? অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান জাতিকে প্রায়ই উপদেশ দেন কৃচ্ছ্রতা সাধনের। এজন্য তিনি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শে অলাভজনক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধের নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষিখাতে ভর্তুকি বন্ধ করছেন। অথচ একবারের জন্য এ বিশাল মন্ত্রিসভার ব্যয়ভার কমানোর কথা বলেননি

ছয়জন পুলিশ সিকিউরিটি হিসেবে পান। মন্ত্রীর অফিস ও বাড়ির আপ্যায়ন খরচ নির্বাহ হয় রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। এ সবের বাইরে একজন পূর্ণমন্ত্রী ২ লাখ টাকা বছরে অনুদান পান। এ টাকা তিনি সমাজসেবামূলক কাছে ব্যয় করতে পারেন।

পূর্ণমন্ত্রীর মতো প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও উপদেষ্টারা সব সুযোগ-সুবিধা পান। শুধু বেতনের হেরফের হয়, মাসে সাড়ে ১৪ হাজার টাকা। আর বার্ষিক অনুদান ১ লাখ টাকা। মন্ত্রণালয়ে পূর্ণমন্ত্রী না থাকলে প্রতিমন্ত্রী জনসংযোগ অফিসারও পান।

পূর্ণমন্ত্রী ঢাকাসহ সারা দেশে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে গাড়ি চলাচল করতে পারেন। প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও উপদেষ্টারা এসব সুবিধা পান রাজধানীর বাইরে গেলে। তবে এরা সবাই পুলিশি নিরাপত্তা পান। গাড়িতে থাকে অন্তত চারজন প্রহরী। যানজট তাদের স্পর্শ করে না।

এক হিসাবে দেখা গেছে, সরকারের একজন মন্ত্রীর পেছনে গড়ে প্রতি মাসে ১২ লাখ টাকা খরচ হয়। তখন ৬০ জন মন্ত্রীর পেছনে মাসেই খরচ হতো ৭ কোটি টাকা। বছরে ৮৪ কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব থেকে দেখা যায় বিগত সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে বর্তমান মন্ত্রিসভার ব্যয় প্রায় ২৫% বেশি। সরকারের বর্তমান মন্ত্রীদের পেছনে মাসে প্রায় পৌনে ৭ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। বছরে খরচ হচ্ছে ৮০ কোটি টাকা। এই অর্থ জাতীয় রাজস্ব বাজেটের খুবই নগণ্য অংশ। তারপরও তো এর যোগান দিতে হয় জনগণের কাছ থেকে পাওয়া ভ্যাট-ট্যাক্সের অর্থ থেকে।

মন্ত্রিত্ব আছে : তাদের কাজ!

গত বছর মে মাসে মন্ত্রিসভায় সর্বশেষ রদবদল করা হয়। তখন আব্দুল মতিন চৌধুরীকে বস্ত্র মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে করা হয় দপ্তরবিহীন। এক বছর ধরে তিনি এ অবস্থাতেই রয়েছেন। সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয় না থাকলেও পূর্ণমন্ত্রীর সমস্ত সুযোগই তিনি পান। থাকেন ২৪ নম্বর বেইলি রোডের বাসায়। রয়েছে তার গাড়ি, পিএস, এপিএস, নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী। শুধু নেই তথ্য কর্মকর্তা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অসুস্থতার কারণে মন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী বাসায় থাকেন। তবে কেবিনেট বৈঠক হলে মন্ত্রণালয়ে যান। এলাকার লোকজনও এখন বাড়িতেই আসেন। মতিন চৌধুরী মাঝে মাঝে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তদবির করে দেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য হওয়ায় তাঁর কথা এখনো অনেক মন্ত্রীই শোনেন। গত ২৩ এপ্রিল তাঁর বাসায় এ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হয়।

'কেমন আছেন আপনি?',

'দেখতেই তো পারছো, বেশ ভালোই আছি।'

'আপনি তো অনেক দিন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী?'

এ প্রশ্নে একটু রেগে গেলেন মতিন চৌধুরী। বললেন, 'দপ্তরবিহীন মন্ত্রী তো অতীতেও বিভিন্ন সময় হয়েছে। এ আর নতুন কি? আমার কাজ আছে। নিয়মিত কেবিনেট মিটিংয়ে যাই।'

আগামীতে দপ্তর ফিরে পাবেন কি না জানতে চাইলে একটু বিচলিত মনে হলো তাঁকে। বললেন, 'আমি তো আর গণক নই যে বলতে পারবো, আগামীতে আমি দপ্তর পাচ্ছি।'

দপ্তর পান বা না পান আগামীতেও যে সংসদ নির্বাচন করবেন তা জোরের সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন।

আব্দুল মতিন চৌধুরী বিগত বিএনপি আমলে পুরো সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁকে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করায় তিনি বেশ ক্ষুব্ধ বলে তাঁর সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে তাঁকে আদৌ দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করে রাখার প্রয়োজন আছে কি না তা নিয়ে বিএনপিতে মতভেদ আছে। মতিন চৌধুরী প্রায় প্রতিদিন সকালে বাড়ির সামনে গাছের নিচে বসে এলাকার লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তবে মন্ত্রীর এপিএস এ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে দেয়নি।

টাঙ্গাইল-৩ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির সংসদ সদস্য লুৎফর রহমান খান আজাদ প্রথমে পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। পরে গত মে মাসে মন্ত্রণালয় রদবদলের সময় নতুন খোলা এনজিও বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় খোলা হয়। লুৎফর রহমান খান আজাদকে পাট মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে এনজিও বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেও কাজ বুঝে পাননি, পাননি স্বতন্ত্র কার্যালয়। পাট মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি রুমকেই এনজিও বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা হয়েছে। এনজিও ব্যুরো চলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে। এনজিও বিষয়ক সমস্ত কাজই ব্যুরো তদারকি করে। ফলে মন্ত্রণালয়ের কোনো কাজই নেই। লুৎফর রহমান খান আজাদ মন্ত্রণালয়ে আসেন। কিছু সময় বসেন। তারপর চলে যান। সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয় চলছে দারুণ অর্থ সংকটে। মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন বিল ও মন্ত্রীর গাড়ির খরচ আসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে। মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোনো বাজেট নেই। কাজ না থাকায় মন্ত্রী উদ্বোধন ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েই সময় কাটাচ্ছেন। ২৪ এপ্রিল নিজ জেলা টাঙ্গাইলে যান। সেখানে তিনি 'দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র ও আপনি' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। এ দিন টাঙ্গাইল নাট্য ফোরাম নাট্য উৎসব উদ্বোধন করেন।

গত ২৩ এপ্রিল প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান আজাদ বেলা ১টায় মন্ত্রণালয়ে আসেন। এ সময় তার সঙ্গে এ প্রতিবেদকের মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিয়ে কথা হয়। 'মন্ত্রণালয় কেমন চলছে?'

একটু মিষ্টি হেসে লুৎফর রহমান খান আজাদ বলেন, 'বেশ ভালোই তো। আমি তো প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে কাজ করে যাচ্ছি'।

'আসলে কি কাজ করছেন?'

'মন্ত্রণালয়ের তো নিয়মতান্ত্রিক অনেক কাজ রয়েছে। সেগুলো করতে হয়।' তিনি আরো বলেন, 'সরকার শিগগিরই এনজিও বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবে, এর জন্য কাজ চলছে।' কারো কারো প্রশ্ন, তাই যদি হয় তাহলে এনজিও ব্যুরো কী করছে?

গত বছর ৬ মে এনজিও বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর এ প্রতিবেদক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও বৈধতা নিয়ে দেখা করেছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহকারী সচিব আজিজুল হকের সঙ্গে। তিনি জানিয়েছিলেন, শিগগিরই মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হবে। অথচ এক বছরেও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, তড়িঘড়ি করে কেন কাজহীন একটি মন্ত্রণালয় খোলা হলো?

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু। গত ১৮ এপ্রিল তিনি গিয়েছেন তাঁর নির্বাচনী এলাকায়। জানা গেছে, এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রম উদ্বোধনের নামে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় কাজ করছেন। আর মন্ত্রণালয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করছে পিএস আমিনুর রহমান! গত ২১ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে ঘন্টাব্যাপী প্রতিবেদক তাঁর কক্ষে অবস্থান করে। এ সময় পিএসকে শুধু তদবির করতেই দেখা যায়। মন্ত্রী ঢাকায়

এই বিশালায়তন মন্ত্রিসভার অন্তত এক ডজন মন্ত্রীর তেমন কোনো কাজ নেই। তাঁরা মন্ত্রণালয় আসেন। সময় কাটান বিভিন্ন তদবির করে। অনেকে আবার কাজ দেখাতে গিয়ে ফাইল চালাচালিতে ব্যয় করেন অতিরিক্ত সময়। এতে স্লথ হয়ে পড়ে নিয়মিত কার্যক্রম। তৈরি হয় সমন্বয়হীনতা। অথচ এসব মন্ত্রীর জন্য রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে প্রতি মাসে ন্যূনতম ১২ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। এমনিতেই অপ্রয়োজনীয় একাধিক মন্ত্রণালয় রয়েছে। সেগুলো পরস্পর সমন্বয় তো করা হয়ইনি বরং নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী দিয়ে মোট রাষ্ট্রযন্ত্রকে মাথাভারী করা হচ্ছে। মাঝখান থেকে শক্তিশালী হচ্ছে আমলাতন্ত্র

ফিরেছেন ২৩ এপ্রিল। ২৪ এপ্রিল সকালে তার মন্ত্রণালয়ে একটি সভা হয়েছে।

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী আসাদুল হক দুলু। তিনি নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে আসেন। মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে ত্রাণ মন্ত্রণালয় হচ্ছে বড় তদবিরের জায়গা। উপমন্ত্রী হিসেবে তার তদবিরেই ব্যস্ত থাকতে হয়। উদ্বোধন ও বিয়ের দাওয়াতেও তিনি ব্যস্ত। তার শিডিউলে ২৪ এপ্রিল রয়েছে বিটিভির 'সোনালি আকাশ' নামক একটি অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দেয়ার পর্ব। ২৫ এপ্রিল তিনি গীতিকবি লোকমানের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখবেন। তবে ২৭ এপ্রিল তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা করবেন।

গত ২৩ এপ্রিল দুপুরে মন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল ভীষণ ভিড়। তদবিরকারীরা নিজ হাতেই সচিবালয়ে ঢোকার পাসবই লিখছেন। উপমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে থাকায় ব্যস্ত মন্ত্রীর পিএস, এপিএস, তদবিরকারীরা। মন্ত্রীর রুমে ঢুকেও একই অবস্থা দেখা গেল। ত্রাণের চাল, গম নিয়ে তদবির। ত্রাণের তদবিরের কাগজ মন্ত্রীর সামনে দেয়া হচ্ছে। ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি এ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বললেন।

'উপমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রণালয়ের কি দায়িত্ব পালন করেন?'

এ প্রশ্ন শুনে তিনি একটু বিব্রত হয়ে বলেন, 'কেন? মন্ত্রণালয়ের সব কাজই তো আমি দেখি। প্রথমে ফাইল আমার কাছে আসে। এ মন্ত্রণালয়ের তো অনেক কাজ।'

'মন্ত্রণালয়ে আপনার বড় সফলতা কি?'

এবার হেসে তিনি দাবি করলেন যে, বিগত বন্যা মোকাবেলাই তার ও মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় সফলতা। 'তারপরও তো রক্ষা নেই। সব সময় পত্র-পত্রিকায় রোষানলে থাকতে হয়।'

উপমন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট যে, ফাইলপত্র নিয়ে কি ধরনের সমস্যা হয়। মন্ত্রণালয়ের সচিব থেকে উপমন্ত্রী তারপর উপমন্ত্রী থেকে মন্ত্রী- এই তিন স্তরে ফাইল ওঠা-নামা করতেই যে সময় ব্যয় হয় তা অনেক সময় জরুরি কাজকেও পিছিয়ে ফেলে।

এখন কৃষি মন্ত্রণালয়ে দু'জন মন্ত্রী। পূর্ণমন্ত্রী এম কে আনোয়ার। উপমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পূর্ণমন্ত্রী এম কে আনোয়ার নিয়মিত সচিবালয়ে অফিস করেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের তদারকি করেন।

প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুইটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছেন বলে মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অবশ্য দাবি করেছেন, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব তিনি পালন করছেন। পূর্ণমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই এ দায়িত্ব পালন করছেন। তার মানে এখানেও সেই দীর্ঘসূত্রতা। সেই সময় ব্যয়।

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী। মন্ত্রণালয়ের চেয়ে তিনি ব্যস্ত হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট নিয়ে। এ কাজে তাকে প্রায়ই বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়। প্রায়ই তিনি থাকেন তার নির্বাচনী এলাকা টাঙ্গাইলে।

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। দুটি মন্ত্রণালয়ে তার একক নিয়ন্ত্রণ। তিনিই দেখেন সব। তবু মন্ত্রণালয়ে দু'জন প্রতিমন্ত্রী। মেজর জেনারেল (অবঃ) এম আনোয়ারুল কবির তালুকদার এবং শাহ মোহাম্মদ আবুল হোসাইন। কার্যত দুই মন্ত্রীরই মন্ত্রণালয়ে তেমন কাজ নেই। ব্যাংক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেই তারা সময় কাটান। দুজনেরই নির্ধারিত কার্যক্রমের প্রোগ্রাম থেকে দেখা গেছে, এসব নিয়েই তারা ব্যস্ত। অন্যদিকে সাইফুরের একক নিয়ন্ত্রণে থাকায় ভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঘন ঘন বিদেশ সফর ও ঢাকার বাইরে অবস্থানের কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পড়ে থাকে। পিছিয়ে যায় কাজ।

এক মন্ত্রণালয়ে একাধিক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী রেখে কাজের গতি স্লথ করে দেয়া হচ্ছে। বাড়ছে তদবিরের পাল্লা। কোনো এলাকায় কোনো একটি স্কুল এমপিওভুক্ত হবে। কোনটি হবে এখনো ঠিক করা যায়নি। কারণ শিক্ষামন্ত্রী যেটি বলেছেন, প্রতিমন্ত্রীর তাতে সায় নেই। আর উপমন্ত্রী তৃতীয় আরেকটির তদবির করছেন। আবার উপমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হয়েও ক্ষমতা দেখানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীরও দলের নীতিনির্ধারক অন্য সিনিয়র মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে তৈরি হচ্ছে দ্বন্দ্ব। এভাবে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দেখা দিচ্ছে 'বটল নেক' সমস্যা

তবু তারা মন্ত্রী

প্রায়ই শোনা যায়, মন্ত্রিসভা ছোট করা হচ্ছে। অদক্ষ, দুর্নীতিবাজ, কর্মহীন মন্ত্রীরা বাদ পড়ছে। বাস্তবে হচ্ছে উল্টো। এক মন্ত্রণালয়ে একাধিক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী রেখে কাজের গতি স্লথ করে দেয়া হচ্ছে। বাড়ছে তদবিরের পাল্লা। কোনো এলাকায় কোনো একটি স্কুল এমপিওভুক্ত হবে। কোনটি হবে এখনো ঠিক করা যায়নি। কারণ শিক্ষামন্ত্রী যেটি বলেছেন, প্রতিমন্ত্রীর তাতে সায় নেই। আর উপমন্ত্রী তৃতীয় আরেকটির তদবির করছেন। আবার উপমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হয়েও ক্ষমতা দেখানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীরও দলের নীতিনির্ধারক অন্য সিনিয়র মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে তৈরি হচ্ছে দ্বন্দ্ব। এভাবে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দেখা দিচ্ছে 'বটল নেক' সমস্যা। মন্ত্রীরা অপ্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের সময় দিচ্ছেন বেশি। কোনো বিষয়ে তদবির করার জন্য লোকজন ছুটছে কখনো মন্ত্রী, কখনো প্রতিমন্ত্রীর পেছনে। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর সহযোগীরা সুযোগ বুঝে হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থ। এভাবেই বাড়ছে দুর্নীতি।

আবার মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীর পারস্পরিক রেষারেষির সুযোগ আমলারাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রভাবিত করছেন। মন্ত্রীরা তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন অধিকমাত্রায়।

অন্যদিকে ঘুরেফিরে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার অপেক্ষা করতে হয়। যেকোনো কাজে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'সবুজ সংকেত' যেন অপরিহার্য। তাই যদি হবে তাহলে আর এতো মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দরকার কী?

গত বছর রাষ্ট্রীয় একটি গোয়েন্দা সংস্থা মন্ত্রীদের কাজ নিয়ে একটি তদন্ত রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছিল। অদৃশ্য কারণে সেটা ফাইলবন্দি হয়ে রয়েছে। কেন মন্ত্রিসভার আকার ছোট করা হচ্ছে না তার কারণ কিন্তু একেবারে অজানা নয়। দলীয় প্রভাব বজায় রাখতে, নির্বাচনে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধি করতে মন্ত্রিসভা বড়ই থাকছে, কর্মহীন অপ্রয়োজনীয় মন্ত্রী-উপদেষ্টার পেছনে ব্যয় ঠিকই হচ্ছে।

আসলে একটি দক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলতে হলে দলীয় স্বার্থ দেখলে চলবে না। ভাগবাটোয়ারার হিসাব বন্ধ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় দুর্নীতিগ্রস্ত অদক্ষ মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে হবে। এ কাজটি সরকার যত দ্রুত করতে পারবে, ততই দেশ ও জনগণের মঙ্গল।